অমিত কান্তি সরকার

মাইগ্রেশন ঃ সভ্যতার এক যাত্রাপথ

শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বব্যাপী মাইগ্রেশন ঘটে চলেছে। রাষ্ট্র, সমাজ, মানুষজন সবাই এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছে, একত্রে মিলেমিশে গড়ে তুলেছে সভ্যতা, সভ্যতার ইতিহাস। বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে আমরা প্রত্যেকেই মাইগ্রান্ট। আমরা বলতে শুধু মনুষ্যজাতিই নয়, উদ্ভিদ প্রাণী সকলের মধ্যেই সৃষ্টির প্রথম থেকেই নিরন্তর ঘটে চলেছে অবশ্যম্ভাবী মাইগ্রেশন। 'Migrate' ইংরেজি শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'migrate' থেকে, যার অর্থ 'to move from one place to another'; আর 'migration' হল 'migrate' এর বিশেষ্যপদ, যার বাংলা প্রতিশব্দ অভিপ্রয়ান, পরিযান, প্রব্রজন, প্রচরন ইত্যাদি। তবে বিষয়ের ব্যাপ্তির সাথে 'মাইগ্রেশন' শব্দ বেশি যথাযথ। 'মাইগ্রেট' শব্দ মানুষের ক্ষেত্রে ১৬১১ সালে, প্রাণীর ক্ষেত্রে ১৬৪৬ সালে এবং পাখির ক্ষেত্রে ১৬৯৭ সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়।

প্রাণের সৃষ্টি, উদ্ভিদের অভিগমন ঃ

পৃথিবীর অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট কোন প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় প্রাণের জন্ম, কিভাবে কোষের জন্ম তা নিয়ে বিস্তর বিজ্ঞান আলোচনা হতে পারে। এই রহস্যময়তা নিয়ে জন উইনধামের 'The Kraken Wakes' এর মত ফ্যান্টাসিও লেখা যেতে পারে, কিন্তু এক কোষী থেকে বহুকোষী প্রাণী, কোষাণুর সৃষ্টি, এ যেন একটা সমাজ তৈরির মতো ঘটনা। ডি এন এ, ডি এন এ স্ট্যান্ডের ভাঙন আর জুড়ে যাওয়া, প্রতিলিপিকরণ, সংখ্যাবৃদ্ধি জীবনের এই ব্যাপ্তি কোষের মধ্যে ঘটে চলেছে, ঠিক যেন কোন সোপ অপেরার সম্পর্কের ভাঙন, নূতন সম্পর্ক তৈরি, হিংসা, দ্বেষের টানটান কাহিনি।

৫০০ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদের হদিশ পাওয়া যায়। তার ১৭০ মিলিয়ন বছর পর Archaeopteris জন্ম হয়। তারা মাটি, জলবায়ু ইত্যাদির নানা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে অরণ্য সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। Archaeopteris এর মত বর্তমান উদ্ভিদও শিকড় ছড়িয়ে নিজে দাঁড়ায়, তারপর অভিগমনের ফলে অনেক উদ্ভিদ অবশেষে বনানীর জন্ম 'Pleistocene age' উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, সেন্ট লুই, কানসাস সিটি বরফ চাদরে ঢাকা থাকার ফলে উদ্ভিদ সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় মাইগ্রেট করেছিল। পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠলে নূতন পরিত্যক্ত মাটিতে তুন্দ্রা উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু করল। ১৮০০০ বছর আগে পাইন অরণ্য সৃষ্টি হয় তারপর আসে বার্চ, ওক ইত্যাদি।

প্রাণীজগতের পরিযান ঃ

হাজার কোটি বছর ধরে কীট, পতঙ্গ, উভচর, সরীসৃপ, পাখি, স্তন্যপায়ী পরিযান করে চলেছে। তারা যাত্রাপথ ঠিক করে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান, দিকচিহ্ন, গ্রহ, নক্ষত্র, চৌম্বকক্ষেত্র ইত্যাদি দ্বারা। তাদের এই পরিযান খাদ্যের অভাব সহনীয় আবহাওয়া, সংখ্যাধিক্য হয়ে যাওয়া কিংবা প্রজননের কারণে হয়ে থাকে। মেরু অঞ্চলের প্রাণীরা খাদ্যের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে বংশবৃদ্ধির কারণে, উত্তর মেরু থেকে ধূসর তিমি ক্যালিফোর্নিয়া চলে আসে শুধুমাত্র এই কারণে। পুরুষ স্পার্ম হোয়েল, অস্ট্রেলিয়ান ক্যাটেল ফিশ, ডায়মন্ড পাইথন, মেয়ে সঙ্গীর খোঁজে মাইগ্রেট করে। গ্রে হোয়েল, কচ্ছপ এবং পেঙ্গুইনের বিভিন্ন প্রজাতি ডিম পাড়তে এবং নিরাপদে সন্তানের জন্ম দিতে মাইগ্রেট কর। পঙ্গপাল এক জায়গায় জড়ো হয়ে ঝাঁক তৈরি করে, শারীরিক সমর্থ হয়ে উঠে বছরে ৩২০০ কিমি উড়বে বলে। নুহরিণ ১০০ কিমি দূর থেকেও বুঝতে পারে বর্ষা আসছে, ঘাস ও জলের খোঁজে সিংহ হায়নার বিপদ সত্ত্বেও তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করে। মনার্ক প্রজাপতি শরৎকালে, শীত যাপন করতে ৪০০০ কিমি কানাডা থেকে মেক্সিকো অরণ্যে পরিভ্রমণ করে। রেড অ্যাডমিরাল প্রজাপতি নর্থ আফ্রিকা থেকে মে মাসে ব্রিটেনে আসে আবার সেপ্টেম্বর এ চলে যায়।

বন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে দলগত মাইগ্রেশনও ঘটে থাকে, যার অন্যতম উদাহরণ আফ্রিকার তানজানিয়া অঞ্চলের সেরেনগেটির 'গ্রেট মাইগ্রেশন'। প্রতি বছর ১.৭ মিলিয়ন বন্যপ্রাণীর 'circular pattern of movement' ঘটে, যার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ কিংবা জেব্রার মত প্রাণীরা থাকে। ২০০৯ সালের দলগত এই মাইগ্রেশনে ২০টিরও বেশী প্রজাতি অংশগ্রহণ করে।

পরিযায়ী পাখী ঃ

পাখিদের পরিযান অন্য এক তাৎপর্য নিয়ে আসে। আমরাও আমাদের মুক্তি, স্বাধীনতাকে নির্মাণ করি 'মুক্ত বিহঙ্গ' এর প্রেক্ষিতে। ঝঞ্ঝা, যুদ্ধ এই সব পরিবর্তনের বার্তাবহ হল পাখি। হোমার ট্রোজান সৈন্যদের আক্রমণকে তুলনা করেছেন পরিযায়ী ক্রেনের সাথে। প্রাচীনকালে গ্রীকরা সোয়ালোকে বসন্তের দূত হিসাবে চিহ্নিত করেছে, যেমন আমরা করে থাকি কোকিলকে, ভুটানে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন তাদের লোকগাথা, সঙ্গীতের অন্যতম প্রধান চরিত্র। অক্টোবরের শেষে লাদাখ কিম্বা তিব্বত থেকে তারা উড়ে আসে আবার মার্চ মাসে ফিরে যায়। ভুটানে নভেম্বর মাসে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয় ব্ল্যাক নেকড ক্রেন উৎসবে। পাখির এই মাইগ্রেসানের মধ্যে এক অদ্ভুত রহস্যময়তা রয়েছে।

প্রাচীনকালে গ্রীক ও ওল্ড টেস্টমেন্টের নবীদের বিভিন্ন আলোচনায় পাখির পরিযানের অনুষঙ্গ এসেছে। তবে মধ্যযুগে এই ধারণা লুপ্ত হয় কেননা তাদের বিশ্বাস কষ্ট হয় পাখি সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। অ্যারিস্টটল সোয়ালো, রেডস্পর্ট, রবিন পাখিদের গতিবিধির কথা নানা আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। খাদ্যের খোঁজে, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে পাখিদের আভ্যন্তরীণ পরিযান হামেশাই ঘটে। পৃথিবীর ১০০০০ প্রজাপতির পাখিদের মধ্যে অন্ততঃ ১৮০০টি প্রজাতি দূরপাল্লার পরিযায়ী। নেপালের জাতীয় পাখি মোনাল ফিয়াসেন্ট ২০০০ থেকে ৪০০০ মিটার মাইগ্রেট করে নিচে চলে আসে, বরফ গললে আবার উপরে উঠে যায়। 'মুক্ত বিহঙ্গ' কি আসলে মুক্ত? তাদের এই আচরণকে কেন্দ্র করে নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখা গেছে শব্দ, গন্ধ, চৌম্বকক্ষেত্রে, শরীরের নানা অংশের সম্মিলিত ক্রিয়া এই উড়ানকে নির্দেশিত করে এমনকি তাদের গতিপথ নির্ধারিত হয় জেনেটিক প্রোগ্রামিং এর ফলে, একেবারে অঙ্ক কষে। কোন পাখি কোন দেশে যাবে কেমনভাবে যাবে এই যাত্রাপথ যেন পূর্বনির্দিষ্ট। তার এদিক ওদিক হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

পরজীবীর মাইগ্রেশন ঃ

স্থলের জীবজন্তু আসার অনেক আগে থেকেই পরজীবীরা এই পৃথিবীতে ছিল তাদেরও মাইগ্রেশন ঘটে। এই যেমন সিফিলিস কে সবসময় চিহ্নিত করা হয়েছে 'আনওয়েলকাম ইমিগ্র্যান্ট' হিসাবে, এরা যেন অন্য কার কাছ থেকে, অন্য কোথাও থেকে এসেছে। ফরাসীদের দাবী এটা ইতালি থেকে, ডাচেদের দাবী এটা স্পেন থেকে, রাশিয়ানদের দাবী এটা পোল্যান্ড থেকে, তাহিতিদের দাবী এটা ব্রিটিশদের কাছ থেকে এসেছে। নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও তথা অনুযায়ী এর প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে ১৪৯৪ সালে। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। চীন মিশরে ৫০০০ বছর আগে, ভারতে ৩০০০ বছর আগে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ২৫০০ বছর আগে এই রোগের হদিশ পাওয়া যায়। এর পেছনেও রয়েছে প্লাসমোডিয়াম পরজীবীর মাইগ্রেশন।

জলের প্রাণীর বাস্তুচ্যুতি ঃ

এই গ্রহে সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন ঘটে সমুদ্রে। প্রতিদিন প্রতিরাতে, আনুভূমিক মাইগ্রেশনের ফলে কোটি কোটি সামুদ্রিক প্রাণীর বাস্তুচ্যুতি ঘটে চলেছে। হাঙর, তিমি, সামুদ্রিক প্রাণী এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে পাড়ি দেয়। মাছেদের গতিবিধি সাধারণত একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাদেরও অনেক প্রজাতি দূরে পরিভ্রমণ করে। ইল মাছ বারমুডার দক্ষিণ পূর্বে সারগাসো সমুদ্রে জন্মালেও খাদ্যের কারণে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ পাড়ি জমায়। স্যামন নদীতে জন্মে সমুদ্রে চলে আসে, ফেলে আসা রাসায়নিক সংকেত অনুসরণ করে আবার নদীতে ফিরে আসে। ডিম পাড়ে, বংশরক্ষা করে নিজে মারা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণ করতে পারা স্তন্যপায়ীর নাম হাম্পব্যাক তিমি যারা ৮৫০০ কিমি সাঁতরাতে পারে। এরা প্রজননের কারণে উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুতে চলে যায় বসন্তে আবার ফিরে আসে।

১৮৬৯ সালে ফারদিনান্দ সে লেসেপস সুয়েজ খাল কাটেন যার ফলে ৫০০র বেশী প্রজাতির সামুদ্রিক জীব, শেওলা, শামুক, শঙ্খ, মাছ ইত্যাদি লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দেয় যা অভিহিত হয় 'Lessepsin migration' নামে, পরবর্তীতে এর ফলে ইজরায়েল ও আন্দালুসিয়ার বাস্তুতন্ত্রে সমস্যা তৈরি হয়। অভিবাসনের যাত্রাপথে অনুষঙ্গ হিসাবে নদী বারবার এসেছে, কেননা নদী এক প্রাকৃতিক সীমারেখা। তাকে অতিক্রম করে, দিকচিহ্ন করে কোনো জনসমষ্টি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে

গমন করেছে, সেকারণে নদীর সাথে তীর্থস্থানের সহাবস্থান ঘটেছে, নদী হয়ে উঠেছে পবিত্র।

মনুষ্যজাতির মাইগ্রেশন ঃ

মাইগ্রেশন এক চিরন্তন, নিরবছিন্ন প্রক্রিয়া, পৃথিবী জুড়ে রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয়। মানুষের এই গতিশীলতা সামাজিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ঘটে। মাইগ্রেশন কখনও দেশের অভ্যন্তরে, কখনও বা দেশান্তরে, কখনও স্বেচ্ছাকৃত, আবার কখনও বা অনিচ্ছাকৃত। আসলে মাইগ্রেশনের সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা, নূতন দেশে নূতন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা। আর সে কারণে রাষ্ট্রসংঘের ভূতপূর্ব সেক্রেটারি জেনারেল বান-কি-মুনের মতে মাইগ্রেশন হল 'Migration is an expression of the human aspiration for dignity, safety and a better future. It is a part of the social fabric, part of our very make up a human family'।

মানব ইতিহাস মাইগ্রেশনের গুরুত্ব ঃ

মানব ইতিহাস, সভ্যতা, সাংস্কৃতিতে মাইগ্রেশন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্মের সাথে মাইগ্রেশনের সম্পর্ক নিবিড়। ১১-১২ শতকে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশেরা খ্রিস্টধর্মের ক্যাথলিক মত এবং মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিব্রজন করে। আর ইহুদিধর্ম প্রচারে ইউরোপ থেকে পশ্চিমে ইউরোপ ও ১৯ শতকে আমেরিকায় গমন করে। ধর্ম শুধু কোন অঞ্চলের মানুষজনের গণ স্থানান্তরে উৎসাহিত করে না, তা এই জনসমষ্টির জীবনযাপনকেও প্রভাবিত করে। আজকের মাইগ্রেশনের সাথে 'ট্রান্সন্যাশনাল রিলিজিয়ন' ধারণার সূত্রপাত সেদিন থেকেই। ১৫-১৭ শতকে পর্তুগিজ ও স্প্যানিশদের নেতৃত্বে ইউরোপিয়ানরা উপকূলজুড়ে অভিযান করে, তার ফলে আমেরিকা, অফ্রিকা, এশিয়া, ওশানিয়ার বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল আবিস্কৃত হয়। সমুদ্রপথে এই মাইগ্রেশনের ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও উভয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে। পরবর্তীতে এর পরিণতি হিসাবে ইউরোপের দেশগুলি ওইসব দেশে তাদের প্রভুত্ব, উপনিবেশ কায়েম করে। একই সময় নিজেদের দেশের মজুর সমস্যা মেটাতে ঔপনিবেশিক দেশগুলি থেকে মানুষজন নিয়ে আসে, ক্রীতদাস ব্যবসাও শুরু হয়, যা পুরোপুরি লুপ্ত হতে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় লেগে যায়। দ্বিতীয়বার মজুর মাইগ্রেশনের ঢল নামে ইউরোপের দেশগুলি, মূলতঃ ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, স্পেন থেকে 'প্রথম বিশ্ব' অর্থাৎ আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণ মানুষের মাইগ্রেশনের আরেক ঢেউ আছড়ে পড়ে মধ্য ইউরোপ জুড়ে, যখন পুনর্বসতির ফলে নুতন দেশের জন্ম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো একবার উচ্ছেদ, বিতাড়ন চলে বিশ্বের নানা দেশে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকশ্রেণীর পৃথিবী জুড়ে মাইগ্রেশন এক অপরিহার্য গতিময় প্রক্রিয়া।

অভিবাসন যেমন সভ্যতার কারিগর, তেমন সভ্যতার কারণে অনেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে সীমান্ত, সমুদ্র পেরিয়ে দলে দলে দেশান্তরিত হয়েছে। ধর্মীয় মানবিকতার কারণে যারা অভিবাসী হয়ে নুতন দেশে আসছে তাদের অভ্যর্থনা করার রীতি ছিল। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে তার উদাহরণ মেলে.....'When you come, I will look after you. Make yourself home in my home; ' If any on your fellow Israelites become poor and are unable to support themselves, help them as you would help a foreigner and stranger;' 'I was a father to the needy, I took up the case of stranger' ইত্যাদি।

রাজনৈতিক মানচিত্রের নিরিখে ঃ

একটা দেশের ভিতরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে; থেকে আসছে, ইংরেজিতে তা 'Out-migrant', যেখানে আসছে, তা হল in-migrant' এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে এই মাইগ্রেশন হলে তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'emigrant' এবং 'immigrant' ।

অবস্থান পরিবর্তনের ভিত্তিতে ঃ

সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মাইগ্রেশন হয়, তা মূলতঃ চাকরির সন্ধানে, নগরায়নের ফলে। এমনকি শ্রমিকের চাহিদা অনুযায়ী কোন এক বিশেষ মরশুমে মাইগ্রেশন হয়ে থাকে। আবার এও দেখা যায় কোন একটা দল এক জায়গায় বসতি স্থাপন করার পর সেই এলাকার জনসমষ্টিকে নিয়ে আসতে উদ্যোগী হয়, যাকে 'চেন মাইগ্রেশন' বলা যেতে পারে। এই ধরণের মাইগ্রেশন আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয়ই হতে পারে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে, শিল্প ও কৃষি শ্রমিকরা মূলতঃ এমন মাইগ্রেশন করে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনে অনেক সময়ই এমনটি ঘটে, একজন চাকরি বা গবেষণা সূত্রে বিদেশে গিয়ে সেখানকার নাগরিকত্ব অর্জন করে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যায়, পরের প্রজন্ম ওই দেশের অভিবাসী হয়ে ওঠে। আমেরিকা, ইংল্যান্ডে ভারতীয়দের এমন 'চেন মাইগ্রেশন' প্রবণতা কয়েক দশক জুড়ে দেখা গেছে। 'ইন্টারন্যাশানল চেন মাইগ্রেশন' সেই দেশগুলিতে বেশী ঘটেছে যেখানে এই সংক্রান্ত আইনের শিথিলতা রয়েছে। বিশ্বায়নের ফলে এই প্রবণতা কমলেও এখনও যথেষ্ট রয়েছে।

বৃত্তাকার মাইগ্রেশন ঃ

যুগ যুগ ধরে এধরণের মাইগ্রেশনের প্রচলন রয়েছে। মূলতঃ কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে এমন যাওয়া আসা ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘের 'ইন্টারন্যাশানাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন', 'গ্লোবাল কমিশন অন ইন্টারন্যাশানাল মাইগ্রেশন' উন্নত দেশগুলির স্থায়ী অভিভাবক, যে দেশগুলি থেকে আসছে তাদের উন্নয়ন, মস্তিষ্ক চালান ইত্যাদি সংক্রান্ত জটিলতা কাটাতে বৃত্তাকার মাইগ্রেশনের (সার্কুলার মাইগ্রেশন) কথা বিকল্প হিসাবে ভাবছে। কেননা এটা হবে অল্প সময়ের জন্য, তার ফলে একাধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা উৎসাহিত হবে, অভিবাসী দেশে পারিবারিক পুনর্মিলন উৎসাহিত না হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক ও বর্ণগত সমস্যা কম দেখা দেবে। অনেক দেশই

এই ধরণের 'সার্কুলার মাইগ্রেশন' কে উৎসাহিত করতে সরকারি স্পনসরশিপ দিচ্ছে বা সম্পত্তিগত অধিকার, ভিসা, যাতায়াত, বিনিয়গের সুবিধা দিচ্ছে। এই মাইগ্রেশনে লিঙ্গভিত্তিক প্রভেদও দেখা যায়, যেমন কেয়ার গিভার হিসাবে মহিলা, আইটি কর্মী হিসাবে পুরুষ, কৃষিশ্রমিক হিসাবে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের চাহিদা বর্তমান। এত কিছুর পরেও এই মাইগ্রেশনের নানা স্কীমে স্থায়ী উপকার হয় উন্নত দেশগুলিরই। অর্থনীতিবিদ বাইদারের মতে শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতি টিকে থাকা নির্ভর করছে অন্য দেশ থেকে অভিবাসী হওয়া শ্রমিকরে ওপর।

মাইগ্রেশনের ইচ্ছা অনিচ্ছা ঃ

এই ধরণের মাইগ্রেশন হতে পারে স্বেচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত। কোন ব্যক্তির ইচ্ছা, পছন্দ, উচ্চাকাঙ্খার ভিত্তিতে যেমন হয়, আবার তা পরিবেশজনিত, রাজনৈতিক কারণের বাধ্যবাধকতা থেকেও হয়ে থাকে। 'রিফিউজি' বা উদ্বাস্তু হল এমন মাইগ্রেশন যখন পুরোনো স্থানে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, আর 'এ্যাশাইলী' বা শরণ প্রত্যাশী হল এমন এক অবস্থা যখন কোন জনসমষ্টি আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে, এখনও আইনত উদ্বাস্তু হয়নি। ২০১৫ সালের তথ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মাইগ্রান্টের সংখ্যা ২৪৪ মিলিয়ান এবং আভ্যন্তরীণ মাইগ্রান্টের সংখ্যা ৭৬৩ মিলিয়ান। আন্তর্জাতিক মাইগ্রান্টদের ৫৮ শতাংশ উন্নত দেশগুলিতে রয়েছে যার মধ্যে ২১.৩ মিলিয়ান রিফিউজি ৪০.৮ মিলিয়ান আই. ডি. পি (Internally Displaced People, মূলত রাজনৈতিক কারণে আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষজন) এবং ৩.২ মিলিয়ন শরণ প্রত্যাশী। ২০১৮ সালে এই আন্তর্জাতিক মাইগ্রান্টের সংখ্যা ২৬০ মিলিয়ন, যা রাষ্ট্রসংঘের ঘোষিত জনসংখ্যার ৩ শতাংশ।

বস্তুত মাইগ্রেশন হল 'পুশ এন্ড পুল ফ্যাক্টর', তা অর্থনৈতিক কারণে, সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে এবং বাস্তুসংস্থানগত কারণে হতে পারে।

অর্থনৈতিক কারণ ঃ

পুশ ফ্যাক্টর ঃ বেকারত্ব, চাকরির অপ্রতুলতা, গ্রামীণ দারিদ্র, জীবনধারণের অনিশ্চয়তা।

পুল ফ্যাক্টর ঃ কাজের সুযোগ, আয় ও সমৃদ্ধির হাতছানি, শিল্প ও প্রযুক্তির কলাকৌশল জানার ফলে চাকরির সম্ভবনা।

সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ ঃ

পুশ ফ্যাক্টর ঃ যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, বর্ণ, ধর্ম, জাত, দাসত্ব, মজুরি দাসত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যানবাহন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কারণে নিরাপত্তাহীনতা।

পুল ফ্যাক্টর ঃ পরিবারের পুনর্মিলন, স্বাধীনতা, সামাজিক বন্ধন, খাদ্য নিশ্চিত, নাগরিক সুবিধার নিশ্চয়তা।

বাস্তুসংস্থানগত কারণ ঃ

পুশ ফ্যাক্টর ঃ শীতের প্রকোপ, জলবায়ুর পরিবর্তন, ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন, খাদ্যাভাব।

পুল ফ্যাক্টর ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের প্রচুর্য, অনুকূল আবহাওয়া।

অভিবাসন দেশে দেশে ঃ

অভিবাসীদের গন্তব্যের প্রথম ২৫টি দেশের মধ্যে আমেরিকা প্রথম, মোট অভিবাসীর ১৯ শতাংশ; তারপর রয়েছে রাশিয়া, জার্মানি দুজন মিলে ৯.৭ শতাংশ দেশগুলিতে অভিবাসনের প্রবণতা বেড়েছে তারপর রয়েছে সৌদি আরব, কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া এমনকি আমাদের ভারতও। যে দেশগুলি তারা যাচ্ছে তাদের প্রথমেই রয়েছে ভারতবর্ষ, তারপর মেক্সিকো, চীন, ইউক্রেন, বাংলাদেশ ইত্যাদি। ভারতবর্ষ তার অনেক সময় সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশগুলির ট্রানজিট দেশ হিসাবেও কাজ করে স্বাভাবিক ভাবেই অভিবাসনের ৭৫ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৬৪ বছর

অভিবাসীদের দেশ আমেরিকা ঃ

উনিশ শতকে আমেরিকার জন্ম হয় অভিবাসনকে ভিত্তি করে, নিজেদের চিহ্নিত করে গৃহহীনদের গৃহ হিসাবে। ১৮৮৩ সালে এম্মা লাজারুসের লেখা কবিতা স্ট্যাচু অ লিবার্টি গায়ে-

'Give me your tried, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tossed tome,
I lift my lamp beside the golden door!'

লক্ষাধিক মানুষ আমেরিকায় অভিবাসী হয়ে আসছে, তাদের বেশিরভাগই মেক্সিকো থেকে অনেক আইন মেনে, অনেকে আইন না মেনে। বেআইনি অভিবাসন ও ড্রাগের চোরা কারবারি রুখতে আমেরিক সরকার নানা নামে তাদের অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে, ক্যালিফোর্নিয়া তে 'গেটকিপার', আরিজোনাতে 'সেপগার্ড' কিংবা টেক্সাসে 'হোল্ড দ্যা লাইন' নামে। দুই দেশের সীমান্তে সংঘাত লেগেই আছে, হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। এক সময় সোভিয়েত সৈন্যদের পর্যুদস্ত করে আমেরিকার জয় ছিল ভিডিও গেমের বিষয়, বর্তমানে ইমিগ্রেশনকে কেন্দ্র করে একাধিক ভিডিও গেম 'The star spangled Banner', 'Smuggler Track' কিংবা অস্ট্রেলিয়া সরকার একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'Kick A migrant' ভিডিও গেম চালু করেছে।

মাইগ্রেশনের প্রাসঙ্গিক কিছু সমস্যা ঃ

সাংস্কৃতিক সমস্যা ঃ

বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজন যখন অভিবাসী হয়ে আসে তখন তাদের সংস্কৃতির প্যাটার্নের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন মাপার মাপকাঠি হল ' ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন'। আমেরিকার এই পরিবর্তন মিল্টন জর্ডনের 'অ্যাসিমিলেশন এন্ড আমেরিকান লাইফ' বইতে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে পরের প্রজন্মের সাথে তাদের অভিভাবকদের মূল্যবোধের সংঘাত লাগে, যখন তারা আশ্রয়দাতা দেশের সংস্কৃতিতে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে। আসলে সামাজিক জীবন, এথনিক জীবন, তার সংস্কৃতি এক গতিশীল প্রক্রিয়া, এটাকে গন্ডিতে বাঁধা অসম্ভব। ফলে অভিবাসীরাও গন সংস্কৃতি আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেদের যুক্ত করে।

সীমানা ঃ

মাইগ্রেশন একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। বর্ডার নিছক দুই দেশের মধ্যে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটা এমন এক সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিসর যাকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের নীতি নির্ধারিত হয়। বর্ডার একটি সামাজিক ধারণাও বটে যা জনসাধারণের কার্যকলাপ, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে, উচ্চকিত ঘোষণা করে 'এটা আমাদের দেশ এখানে ঢুকতে আমাদের অনুমতি লাগবে'। এই ধারণা তৈরিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ, রাষ্ট্রনেতারা তাদের উচ্চাকাঙ্খা চরিতার্থ করতে কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাধ্যকতায় এটা করে থাকে। পাঁচিল তারকাঁটার বেড়া তৈরি হয়, নজরদারি চলে আর তা পেরোলে যুদ্ধ বাঁধে। তবে এটাও ঠিক সাধারণ মানুষের আকাঙ্খার কারণেই বার্লিনের পাঁচিলকে টিকিয়ে রাখা যায় না। বর্ডার বলতে যদিও একটা লাইন, গণিতের ভাষায় যার শুধু দৈর্ঘ্যে আছে; গার্ভরিলিস (২০০৮) এর সংজ্ঞায় বর্ডার একটা 'জোন' যা থেকে 'বর্ডার ল্যান্ড' শব্দবন্ধ বর্ডারের ক্ষেত্রে বেশী উপযুক্ত। কাশ্মীর প্রসঙ্গে এই ভাবনা সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠে। অর্থনীতিবিদদের একাংশের ধারণা ছিল বিশ্বায়ন 'বর্ডারলেশ সোসাইটী' উপহার দেবে। কিন্তু মাইগ্রেশন প্রশ্নে একটা নিছকই অলীক কল্পনা। ৬০-৭০ দশকে 'ব্রেন ড্রেন' ছিল এক প্রচলিত শব্দযুগল, মূলতঃ শিক্ষিত, দক্ষ যুবকদের উচ্চশিক্ষা, চাকরির কারণে বিদেশে পাড়ি দেওয়া। রাষ্ট্রসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষের ওপরে। দিন দিন তা বেড়েই চলেছে, বর্তমানে উন্নত দেশগুলির বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় প্রতি দশজনের একজন উন্নয়নশীল দেশের। প্রতিশ্রুতিময় দক্ষ মেধাবী মানুষজন অভিবাসী হওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলি লাভবান হচ্ছে, আর ক্ষতি হচ্ছে সেইদেশগুলির যেখান থেকে তারা যাচ্ছে। এমন প্রচলিত ধারণার উল্টো বক্তব্যও রয়েছে, অর্থনীতিবিদেরা মনে করেন বৈদেশিক রেমিটান্সের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। তবে 'ব্রেন ড্রেন' ধারনাও পরিবর্তন এসেছে, বর্তমানে একে অভিহিত করা যেতে পারে 'ব্রেন সার্কুলেশন' নামে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দক্ষ মেধাবী মানুষজন দেশে ফিরে আসেছ 'এন্টারপ্রিনেনার' হয়ে, দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করছে। দেশের অভ্যন্তরের আমলাতান্ত্রিক ও পরিকাঠামোগত প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে বহুজাতিক কর্পোরেশন তৈরি করছে এবং ক্রমশ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এমনকি তারা বিজ্ঞানপ্রযুক্তির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তৈরি করছে যাতে কম খরচে দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, শ্রমিকের যোগান অব্যাহত থাকে আর এই ব্যাপারে উৎসাহিত করছে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলি। এইভাবে 'ট্রান্স নেশান ইন্টারপ্রিনিয়োর' তৈরি হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাজারের ব্যাপ্তি ঘটছে। আর নিজের দেশেই উচ্চশিক্ষা ও চাকরি পাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমছে। আই টি সেক্টর, সফটওয়্যার তৈরির ব্যবসায় এই ধরণের লগ্নি বেশী সফলতা লাভ করেছে। চীন, তাইওয়ানে এই প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয়, এখন ভারতেও এই কর্পোরেট ব্যবসার বাড় বাড়ন্ত।

অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটান্সের অঙ্কে ভারত সব থেকে এগিয়ে ৮০ বিলিয়ন ডলার, যা জি ডি পি-র ২.৮০ শতাংশ; তারপর চীন, ফিলিপিন্স, মেক্সিকো রেমিটান্স ও জি ডি পি র পরিসংখ্যান যথাক্রমে ৬৭, ৩৪ ও ৩৪ বিলিয়ন ডলার এবং ০.৪৯%, ৯.১৪৪ ও ১.৫৪ শতাংশ।

নাগরিকত্ব ঃ

নাগরিকত্ব হল কোন ব্যক্তির আইনি বৈধতা যার মাধ্যমে নাগরিক স্বাধীনতা, অধিকার, স্বায়ত্ব ও সুযোগ সুবিধা সুরক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক মাইগ্রেশনের প্রভাব ও বাস্তবায়নের কথা মাথায় রেখে বর্তমান 'গ্লোবাল সিটিজেনশিপ' বা 'কসমোপলিটান সিটিজেনশিপ' এর ধারণা এসেছে, কিন্তু তা বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুনার মাইরডাল সেই ১৯৫৭ সালে ধারণা দেন অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশের যাওয়ার প্রবণতা ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী রূপ নেবে, যার ফলে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে এই ধারাবাহিক মাইগ্রেশন চলবেই। এটা বন্ধ করতে বিভিন্ন দেশ নীতি নিচ্ছে যাতে 'কিউমুলেশন কজেশন অফ মাইগ্রেশন' বন্ধ করা যায়, এর জন্য তারা নানা 'রিটার্ন প্রোগ্রাম' হাজির করছে, কিংবা অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে সুযোগ সুবিধাকে খর্ব করছে। নাগরিকত্ব ভাবনায় এখন 'ডেনিজেন' শব্দের আমদানি হয়েছে, এরা হল সেই জনসমষ্টি যারা তাদের কাঙ্খিত দেশে রয়েছে, কিছু সুবিধা পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সব নাগরিক অধিকার, যেমন ভোটের অধিকার পাচ্ছে না। উদাহরণ হিসাবে আমেরিকার 'গ্রীণ কার্ড হোল্ডার' কিংবা ব্রিটেনের 'ইনডিফিনাইট লিভ টু রিমেন' বলা যেতে পারে। ইদানীংকালে অল্প বয়েসি অনেকেই ভোটের অধিকারের মত বিষয় নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়, সেক্ষেত্রে গ্রীন কার্ড থাকলেই তাদের যথেষ্ট। ফলে বিভিন্ন প্রশ্নে এদের সংঘাত বাঁধে স্থায়ী নাগরিকদের সাথে, নিয়ম কানুনের বদল ঘটে। আমেরিকায় ২০০৫ সালে যতজন নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য ছিল তার ৫৯ শতাংশ কে দেওয়া হয়েছে। আর এক্ষেত্রে কোন দেশকে প্রাধান্য দেবে তা ঠিক করবে আমেরিকাই, যেমন মোট মেক্সিকান আবেদনকারীর ৩৫ শতাংশ কে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বিতাড়ন ঃ

বিতাড়ন অভিবাসনের চূড়ান্ত অমানবিক ঘটনা। রাষ্ট্র সংঘ এ ব্যাপারে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করলেও বিতাড়ন ঘটেই চলেছে। সেই অতীত ইতিহাসে ১২৯০ সালে ইংল্যান্ড থেকে, ১৪৯২ সালে স্পেন থেকে ইহুদী বিতাড়ন; বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপিয়ান দেশগুলি আফ্রিকা, এশিয়া থেকে উপনিবেশন গুটিয়ে আনার পর 'পপুলেশন এক্সচেঞ্জ' এর নামে বিতাড়ন; দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে নাৎসী দ্বারা ইহুদী বিতাড়ন; ৯০র দশকে বসনিয়া, রোয়ান্ডাতে 'এথনিক ক্লিনজিং'; ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পতনের পর আমেরিকা, ইউরোপ থেকে মুসলিম বিতাডন; হালে মায়নামার কিংবা ভারত থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়ন; সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বিভিন্ন সময় মানব অধিকার প্রশ্নে উদ্বাস্তু শিবির, সরকারী সাহায্য প্রকল্পের বাগাড়ম্বর থাকলেও সবসময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্যোগ কাজ করে উদ্বাস্তু বিতাড়নের। এক সময় লুফথান্সা বিমান কোম্পানী এই ধরণের অভিবাসীদের উৎসাহিত

করতে 'ডিপোর্টেশন ক্লাস' চালু করে, পরে প্রতিবাদের ফলে বাধ্য হয় ওই ক্লাস তুলে দিতে।

মাইগ্রেশনের ভাল মন্দ ঃ

যে দেশে যাচ্ছে, সে দেশের প্রেক্ষিতে ঃ

ভাল ঃ

- দক্ষ কর্মী দিয়ে শূন্য পদ ভর্তি হচ্ছে
- অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্থায়ী হয়
- অভিবাসীরা বাড়তি প্রাণশক্তি নিয়ে আসে ফলে কাজের গতি অব্যাহত থাকে
- সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য ও শ্রী বৃদ্ধি আনে

মন্দ ঃ

- মজুরির নিম্নগামিতা ঘটে
- কম পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়া যায় বলে কর্মকর্তাদের উৎপাদনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ট্রেনিং নেওয়ার উৎসাহ কমে যায়
- অভিবাসীরা শোষিত হয়
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নাগরিক সুবিধার ব্যাঘাত ঘটে
- বেকারত্ব বেড়ে যায়
- স্থানীয় লোকেদের সাথে সাংঘাত বাড়ে
- ক্রাইম, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বেড়ে যায়।

যে দেশ থেকে আসছে, সেই দেশের প্রেক্ষিতে ঃ

ভাল ঃ

- উন্নয়শীল দেশ বৈদেশিক রেমিট্যান্স এর ফলে লাভবান হয়।
- বেকারত্ব কমে যায়
- দেশে ফিরে যায় একজন দক্ষ স্বচ্ছল আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্পন্ন মানুষ

মন্দ ঃ

- দক্ষ, কুশলী যুবক বয়েসের লোকজনের সংখ্যা কমে যায়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এমনটি ঘটলে বিপত্তি আরো বাড়ে
- পরিবার দেশে থেকে যাওয়ার ফলে সামাজিক সমস্যা দেখা যায়, বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে

আভ্যন্তরীণ কারণে বাস্তুচ্যুত ঃ

অনেক সময়ই মানুষজন যুদ্ধ, হানাহানি, উদ্দেশ্যে প্রণোদিত মানাবাধিকার লঙ্ঘন, প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণে দেশের অভ্যন্তরেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে বাধ্য হয়। ২০১১ সালে যার সংখ্যা ছিল ২৬.৪ মিলিয়ন, যার মধ্যে কলম্বিয়া সবচেয়ে বেশী ৩.৯ মিলিয়ন, তারপরই রয়েছে ইরাক, সুদান, কঙ্গো, সোমালিয়া, সিরিয়া। দুটোর মধ্যে মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য রয়েছে, উদ্বাস্তরা অনেকক্ষেত্রেই আইনি মর্যাদা পায়, এক্ষেত্রে পায় না। এক্ষেত্রে সবসময় দেশের, রাজ্যের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং মানাবাধিকার প্রশ্নে চাপানউতর চলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই হয়ে উঠে দাঙ্গা ও হিংসার সংঘটক। এমন অবস্থায় নারী, শিশু, বয়স্ক জনসমষ্টি সবচেয়ে বিপন্ন হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে আভ্যন্তরীণ কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষদের মধ্যে আত্মহত্যার মাত্রা জাতীয় গড় মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এক সাধারণ বিষয়, নগরায়ন, বেকারত্ব ছাড়াও রাজনৈতিক কারণে হানাহানি, মনবাধিকার লঙ্ঘনের মত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। উত্তর পূর্বের অটটি রাজ্যে 'ইন মাইগ্রেশন' একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু। 'ইন মাইগ্রেশন' এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিঘ্ন ঘটছে তা নয়, রাজ্যগুলি উপজাতি অধ্যুষিত হওয়ায় তাদের সংস্কৃতিও বিপন্ন হচ্ছে।

মাইগ্রেশনের অর্থনীতি ঃ

মাইগ্রেশনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ রয়েছে ঃ

- নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক থিওরি ঃ অর্থনীতির এই ধারণার ভিত্তি হল দুই অঞ্চলের মজুরির ব্যবধান এবং তার সাথে যুক্ত শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান।
- ডুয়েল লেবার মার্কেট থিওরি ঃ লেবার মার্কেটের 'পুল ফ্যাক্টর' এর কারণে দক্ষ শ্রমিকদের উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে অভিবাসন, মজুরি বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্ভর ডুয়াল লেবার মার্কেট তত্ত্ব
- নিউ ইকোনমিকস অফ লেবার মাইগ্রেশন ঃ লেবার মাইগ্রেশনের নয়া অর্থনীতি তত্ত্বে মাইগ্রেশনের ধরণকে ব্যক্তি শ্রমিকের মজুরি, পারিতোষিক ইত্যাদি নিরিখে না দেখে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষিতে যেখানে রোজকার দিনযাপন, দেশে টাকা পাঠানো সবকিছুই বিচার্য।
- রিলেটিভ ডিপ্রাইভেশন থিওরি ঃ আপেক্ষিক বঞ্চনার তত্ত্বে অভিবাসনের কারণ হল একজন তার প্রতিবেশীর সাথে আয়ের বৈষম্যের তুল্যমূল্য বিচার। প্রথমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে বাড়িতে টাকা পাঠানোর মাধ্যমে পরিবারের প্রতিষ্ঠা, যা দেখে তার প্রতিবেশী পরবর্তীতে মাইগ্রেশনে উৎসাহিত হয়ে উঠে।
- ওয়ার্ল্ড সিস্টেমস্ থিওরি ঃ মাইগ্রেশনকে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষিতে ভাবা, বিভিন্ন সমাজের মিথস্ক্রিয়ায় সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। উন্নত দেশগুলিতে মজুরি বেশী হওয়ার কারণে শ্রমনির্ভর জিনিসপত্র উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানি করা ফলে সেখানকার শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি হয়। পাশাপাশি পুঁজিনির্ভর জিনিসপত্র উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে রপ্তানির ফলে মজুরি ও আয়ের ভারসাম্য বজায় থাকে, ফলে অভিবাসনের প্রবণতা কমে।
- ওস্মোসিস দি ইউনিফায়িং থিওরি অফ ইউম্যান মাইগ্রেশন ঃ মাইগ্রেশনের অন্য তত্ত্বগুলি ভূগোল, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি নির্ভর। কিন্তু মাইগ্রেশনের অভিস্রবণ তত্ত্বে ইতিহাসকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দজেলটি (২০১৭) র মতে মাইগ্রেশন দু ধরনের, একটি সহজ, অপরটি জটিল। প্রথমটি আবার বিভাজিত হয়, প্রসরণ, স্থানীকরণ, কেন্দ্রীভবনের সময়কালে; এই সময়ে অনুকূল পরিবেশ, জলবায়ু, নিরাপত্তা, জনবসতির ঘনত্ব ইত্যাদি হল মাইগ্রেশনের নির্ধারক। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ দ্রুত হয়, নতুন উপনির্ধারক এসে পড়ে যার ফল হয়, বেকারত্ব, যোগাযোগ

অভিবাসন নীতি ইত্যাদি। মাইগ্রেশন যেন ঠিক বিজ্ঞানের 'অভিস্রবণ' প্রক্রিয়া, যেখানে দেশ হল জীবকোষ, বর্ডার হল অর্ধভেদ্য পর্দা এবং মানুষ হল জলের আয়ন। কম মাইগ্রেশন চাপযুক্ত দেশ থেকে বেশী চাপযুক্ত দেশে মানুষ গমন করছে। আর তা পরিমাপ করা যাবে মানব মাইগ্রেশনের নির্ধারকদের থার্মোডাইন্যামিকস এর দ্বিতীয় সূত্রের ভেরিআবেল বসিয়ে, কেননা বিজ্ঞানের অভিস্রবণ ক্ষেত্রে চাপও মাপা হয় ওই সূত্রকে নির্ভর করেই।

মাইগ্রেশন ও জিনতথ্য ঃ

মূলত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বিগত ২৫ বছরের ওপর বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল আজকের মানুষ ৫০০০০ বছর আগে আফ্রিকা থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিয়ান্ডারথালদের উচ্ছেদ করে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু ফসিল, কংকাল ইত্যাদি থেকে পাওয়া জিন তথ্য এই ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে, আফ্রিকা থেকে আসা জনজাতি নিয়ান্ডারথালদের উচ্ছেদ করেনি এবং একসাথে বসবাস করে, ফলে জিনের সংমিশ্রণ ঘটে। এশিয়ার কিছু জনজাতির সাথেও এমন সংমিশ্রণ ঘটে। এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে শুধুমাত্র আফ্রিকা থেকেই মাইগ্রেশান হয়নি পরবর্তীতে তার কিছু অংশ আফ্রিকাতে ফিরেও গেছে এবং ৪ থেকে ৭ শতাংশ জিন এই ফিরে আসা জনজাতির থেকে পাওয়া। জিন তথ্য থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে, ইউরোপজুড়ে কৃষির বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি, বিভিন্ন প্রজাতির চোখের মণি বা ত্বকের রঙ, এমনকি কোন নির্দিষ্ট জনজাতির রোগ, খাদ্যাভাস বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, সবকিছুই মাইগ্রেশনের ফল। আর তা ঘিরেই তৈরি হয়েছে নানা সভ্যতা, সংস্কৃতি।

ভারতে আর্য আগমন ও জিনতথ্য ঃ

ইদানীংকালে একাধিক বিজ্ঞান গবেষণাপত্র সিন্ধু সভ্যতা, আর্য আগমন, ইন্দো ইউরোপীয়ন ভাষা সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা বিশ্বাসে নাড়া দিয়েছে। নাৎসি মদতপুষ্ট মতবাদ ছিল ঘোড়ায় চড়ে আর্যরা ভারতে এসেছিল এবং পথিমধ্যে যাদের দেখেছিল তাদেরই জয় করেছিল। একে বিরোধিতা করে হিন্দুত্বের প্রচারকদের 'আউট অফ ইন্ডিয়া' তত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দোইউরোপীয় ভাষা ভারতেই সৃষ্টি, আর এখান থেকেই তা পশ্চিমে ছড়িয়েছে, যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ নির্ভর তথ্য, আর এই মাইটোকোন্ড্রিয়াল ডি এন এ আসে কেবলমাত্র মায়ের কাছ থেকে। কিন্তু এই মতবাদ বাতিল হয়েছে, বর্তমানের পুরুষ থেকে পুরুষে আসা ওয়াই ডি এন এ নির্ভরগবেষণালব্ধ তথ্যে, সেই অনুযায়ী ব্রোঞ্জ যুগে যে মাইগ্রেশন হয়েছিল তা থেকেই জনজাতি মধ্য এশিয়া, ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে সিন্ধু সভ্যতা কাদের নিয়ে, তারা দ্রাবিড় না দক্ষিণে চলে আসা আর্য, প্রশ্ন থেকে যায়!

ভারতের দুটি জনজাতি অ্যানচেস্ট্র্যাল নর্থ ইন্ডিয়া (এ অ্যান আই) এবং অ্যানচেস্ট্র্যাল সাউথ ইন্ডিয়ানস্ (এ এস আই) তৈরি হয়েছে। যে তিনটি সম্ভাব্য গোষ্ঠীর মিশ্রণের সমহারে, তারা হল ঃ

- সবচেয়ে পুরোনো হল দক্ষিণ এশীয় শিকারি জাতি যারা এখন আন্দামানে বসবাস করে, এদের বসা যেতে পারে অ্যানসিয়েন্ট অ্যানচেস্ট্র্যাল সাউথ ইন্ডিয়ানস্ (এ এ এস আই)।
- তারপর ইরান থেকে আসা কৃষিজীবী, যারা এই উপমহাদেশে এসেছিল গম, বার্লি ইত্যাদি চাষ করত।
- সবশেষে স্তেপ মেঘপালক যারা মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থেকে উত্তর আফগানিস্তানে বসবাস করত, এই জনজাতিই পূর্বে 'আর্য' নামে পরিচিত ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, এ এস আই হল প্রথম ও দ্বিতীয়ের মিশ্রণ, যেখানে প্রথমেই আধিক্য বেশী, আর এ এন আই এর ক্ষেত্রে উৎপত্তিতে প্রথম দুটি ছাড়াও তৃতীয়টির উপস্থিতি রয়েছে, সে কারণেই তারা আর্য হিসাবে অভিহিত।

বস্তুত গবেষকরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা হল ঃ

- এ এ এস আই ও ইরানি কৃষিজীবীরা প্রথমে সিন্ধু উপত্যকায় জনবসতি তৈরি করে
- সিন্ধু সভ্যতার শেষ ভাগে ২০০০-১০০০ বিসি তে স্তেপ মেঘপালকেরা দক্ষিণে যাত্রা করে ও সিন্ধু উপত্যকার জনজাতির সম্মুখীন হয়, তার ফলে সংমিশ্রণ ঘটে।
- সিন্ধু উপত্যকার এই জনজাতির কিছু অংশ আরো দক্ষিণে চলে যায়।
- ইতিমধ্যে উত্তরে স্তেপ মেঘপালকদের সাথে সিন্ধু উপত্যকার জনজাতির সংমিশ্রণের ফলে এ এন আই জনজাতির সৃষ্টি হয়।
- পরবর্তীতে এ এন আই ও এ এস আই জনজাতিক মধ্যে পুনরায় সংমিশ্রণে ফলে জন্ম হয় দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর। অতএব সিন্ধু সভ্যতা সেতু রচনা করেছে আজকের ভারতের জনগোষ্ঠীর। প্রাচীন ডি এ এ এবং বর্তমানের দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের জিনোম তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে সিন্ধু উপত্যকার সীমান্তবর্তী জনগোষ্ঠী থেকেই দক্ষিণ এশিয়ার জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি।

গবেষণার তাৎপর্য ঃ

- আর্য আগমন অংশত হলেও ঘটেছিল, যদিও সেই নামে উল্লেখিত হয়নি। স্তেপ মেঘপালকদের উপমহাদেশে আগমনের কারণেই ইন্দো ইউরোপীয়ন ভাষা, সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে, যেহেতু এদের অনেকেই পশ্চিমে ইউপোরেও চলে যায়।
- গবেশকরা আরও দেখেন, ১৪০টি ভারতীয় গ্রুপের মধ্যে ১০ টি গ্রুপের ক্ষেত্রে সিন্ধু উপত্যকার চেয়ে স্তেপ থেকে উৎপত্তির প্রমাণ মিলেছে। এমনই দুটো গোষ্ঠী হল ব্রাহ্মনতেওয়ারি এবং উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মন; এই ব্রাহ্মণ বলতে গেলে পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্তেপদের মিশ্রণ বেশী ঘটেছে, মূলতঃ তারাই বৈদিক সংস্কৃতির প্রচারক।
- আউট অফ ইন্ডিয়া তত্ত্ব জিন তথ্যের ভিত্তিতে মেনে নেওয়া কষ্টকর। ইরান থেকে আসা কৃষিজীবীদের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার শিকারিদের তেমন কোন মিশ্রণ ঘটেনি; 'and thus the pattern we observe are driven by gene flow into South Asia and not the reverse.'
- কিছু তথ্য আছে যা থেকে বলা যায়, সিন্ধু উপত্যকার জনজাতি বাইরে তুরান অঞ্চলে গমন করে, যার ভিত্তি Bactria-Margiana Archaeological Complex এ পাওয়া কিছু তথ্য, তাদের খুব সামান্য

অংশেরই দক্ষিণ এশিয়ার শিকারিদের সাথে মিশ্রণ ঘটেছিল আর তা থেকেই হয়ত ভাবা হয়েছিল সিন্ধু উপত্যকা থেকেই তুরান মাইগ্রেশন হয়েছিল। পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকায় বসবাসকারী জাতির সাথে এদের কিছু মিল পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতা ও রাখিগারহির আবিষ্কার ঃ

১৯৬৩ সালের হরিয়ানার রাখিগারহিতে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়, প্রসঙ্গতঃ তা আয়তনে মহেঞ্জোদাড়োর থেকে অনেকই বড়। এই নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় রাখিগারহির সভ্যতা ৪৫০০ বছরের পুরোনো। ভারতবর্ষে আর্য আগমন, আর্যসভ্যতার সাথে সিন্ধু সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে সংশয় থাকলেও হিন্দুত্ববাদীরা প্রথম থেকেই আর্যসভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতার সমার্থক করে প্রচার করে। ইদানীং কালে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে ২০১৪ সাল থেকে রাখিগারহি উদ্ধার হওয়া কংকাল, দেহাবশেষ ঘিরে বিজ্ঞান গবেষণা অন্য এক মাত্রা পায়। ১৯৬৬ তে লেখা আর এস এস এর সংঘচালক গোলওয়ালকরের 'ব্রাঞ্চ অফ থটস্' কিংবা ২০১৩ সালের আমিশ ত্রিপাঠির 'সায়েন্স ভ্যালিডেটস বৈদিক হিস্ট্রি' ইত্যাদি বইপত্র সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। রাখিগারহির বর্তমান গবেষণালব্ধ ডি এন এ তথ্য আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছে দেশের-বিদেশের নামজাদা বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদেরা। 'হু উই আর এন্ড হাউ উই গট হেয়ার' গ্রন্থের লেখক হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জিন বিজ্ঞানী ডেভিড রেইখের মতে 'What can genetics add? It cannot tell us what happened at the end of the Indus valley civilization, but it can tell us if there was a collision of peoples with very different ancestries. Although mixture is not itself proof migration, the genetic evidence of mixture proves that dramatic demographic change occurred close to the time of the fall of Harappa.' কিম্বা বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার বলেন 'The Indus valley civilization was primarily urban and literate whereas the vedic people were essentially agro-pastrol, lacking both urbanism and the use of a script.'

ভারতীয় জনজাতির বংশ পরিচয় হল বিভিন্ন সময় মাইগ্রেন্ট হয়ে আসা নানা জনজাতির সংমিশ্রণ। 'Out of Africa' মাইগ্রেশন ঘটে ৫৫০০০-৬৫০০০ বছর আগে। কৃষি কেন্দ্রিক মাইগ্রেশন হয় ১০০০০ বিসি তে পশ্চিম এশিয়া থেকে। অস্ট্রো-এশিয়া ভাষী মুন্ডারা কিংবা গারো অঞ্চলের তিব্বতি-বর্মণ এসেছিল পূর্ব এশিয়া থেকে। আমাদের সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতি নানা বংশ পরিচয় ও মাইগ্রেশনের সম্বলিত রূপ। 'Out of Africa' র জমির সন্ধানে নির্ভীক অভিযাত্রীদের মাইগ্রেশন, সিন্ধু সভ্যতা ঘিরে কৃষির নানা পন্থার আবিস্কার, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উন্মেষ, সংস্কৃত ভাষা ঘিরে আচার বিশ্বাস এবং তাকে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিবর্তন, আরো পরে বণিক সম্প্রদায়ের আগমন ও বসতি স্থাপন, সব মিলেই ভারতীয় সভ্যতা।

পরিকথা ঃ

মাইগ্রেশন, তার সমস্যা নিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে বিভিন্ন ফোরামে সহনশীলতার সঙ্গে সদর্থক আলোচনা প্রয়োজন। আলোচনায় যে দেশ থেকে আসছে আর যে দেশে যাচ্ছে তাদের উভয়ের পারস্পরিক সমস্যাকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। মাইগ্রেশন প্রশ্নে, সর্বস্তরে নিরন্তর আলোচনা সাপেক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত ও রূপরেখা নির্দেশিত না হলে তজ্জনিত বর্ণবৈষম্য, জাতিবিদ্বেষ, বিদেশী ভীতি অনিবার্যভাবে বিশ্বশান্তিতে গভীর সংকট ডেকে আনবে। এতো কিছুর পরেও প্রশ্ন থাকছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা কি কেবল স্বপ্নই দেখে যাবো, যেমন দেখতেন জন লেনন ঃ

".....Imagine all the people living for today
Imagine trere's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you.....
.....Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Inagine all the people sharing all the world, you.....